টাইপ-সি

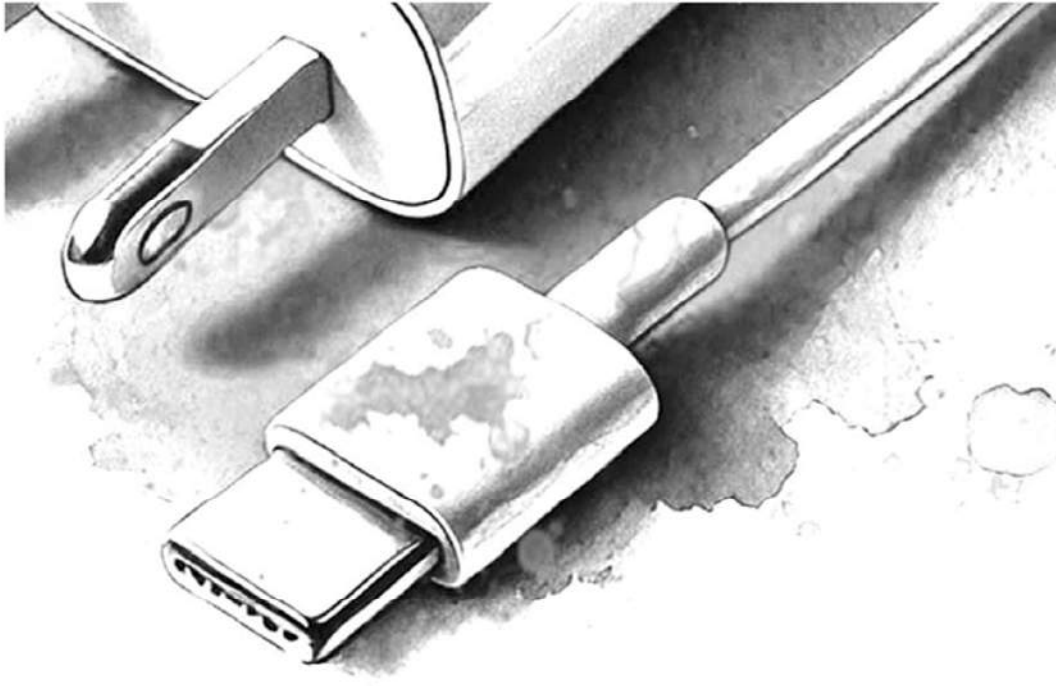

টাইপ-সি

লুৎফর হাসান

অন্যপ্রকাশ

এত রাতে সামনে ওটা কে দাঁড়িয়ে আছে ? পরিমল আবার তাকায়। আকারে প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেকলেও একটা শিশু। তার দুই হাতে দুটো মাথার খুলি। সেই খুলি থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে এই দীর্ঘ দেহের শিশুর হাতের রক্তাক্ত খুলি কীভাবে দেখা যাচ্ছে ? পরিমল বাঁচতে চায়। সে শক্তি সঞ্চয় করে বলে, এই, সামনে থেকে সরে দাঁড়া বলছি। পরিমলের কথা শুনে সরে দাঁড়ায় না সে। সামান্য ওপরে উঠে যায়। শূন্যে ঝুলে থাকে। পরিমল তার সাইকেল তুলে তাতে উঠে বসে টান দিতে যায়। এক টানে জলের গভীরে পড়ে যায়।

ঘটনার সূত্রপাত কারও কথা না শুনে অন্ধকার রাস্তায় পরিমলের একা বাড়ি ফেরা। বারবার সাইকেলের চেইন পড়ে যাচ্ছিল পরিমলের। এত রাতে অন্ধকার ঘুটঘুটে রাস্তায় সাইকেলের চেইন খুলে যাওয়াটা তার কাছে অশুভ সংকেত মনে হচ্ছে। বাড়ি পৌঁছাতে আরও তিন কিলোমিটারের মতো রাস্তা বাকি। এই তিন কিলোমিটারের মধ্যে বাড়িঘর বলতে ব্রিজের গোড়ায় একটা দোকান। সেই দোকানের কর্মচারী কখনো থাকে, আবার থাকে না। শেষবার যখন চেইন পড়ল, তখন সে টর্চ মারতেই দেখল আর টর্চ জ্বলছে না। পেছনে কত দূর এসেছে, মনে করতে চায় না সে। সামনে আর কত পথ বাকি, সেটা জানলেই হবে। তবে সামনে এমনিতেই নামতে হতো। ওটা বিলের রাস্তার মাঝখানে একটা ব্রিজ। সড়ক থেকে বেশ উঁচু। আবার নামার সময় বেশ ঢালু। ব্রিজের রেলিং ছিল, সেটা গত বছর দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভেঙে পড়েছে। আজ আর চলন্ত সাইকেল থেকে নামতে হলো না। পরিমল সাইকেল ঠেলেই যাবে ব্রিজ পর্যন্ত। সে জানে, পরিচিত রাস্তার অন্ধকারেও একটা চেনা রেখা থাকে। আবার অপরিচিত রাস্তায় ঝকঝকে আলো থাকলেও গোলমাল লেগে যায়। আজ এমনিতেই অমাবস্যা থেকে দুই দিন আগানো। ফলে আলো থাকার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। পরিমল দেখার চেষ্টা করল যে ব্রিজের দোকানে কেউ আছে কি নেই। থাকলে ভেতরে আলো জ্বলে। আর না থাকলে আলো জ্বলে না। আজ কেউ নেই। এই মধ্যরাতে সে যেন অন্ধকার সমুদ্রে

পথহারা এক নাবিকের মতো। কোনো বিপদ হলে চিৎকার দিলেও কেউ শুনবে না। আবার ভাবছে, কিসের বিপদ ? আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে সে তার বুকে থুতু ছিটিয়ে নেয়। 'রাম রাম' বলে বুলি আওড়ায়। সামনে এগোয়। তার কেমন হাত-পায়ের শক্তি কমে আসে। ভয় পেলে চোখ বন্ধ করার স্বভাব থাকলেও এই মুহূর্তে সে চোখ টেনে বড় করার চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে ব্রিজের ওপর উঠতেই তার হাত থেকে সাইকেল পড়ে গেল। সে চোখ বন্ধ করে ফেলে। 'রাম রাম' চিৎকার দিতে গিয়ে থেমে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ। তারপরই ঘটনা ঘটে যায়।

এখানে বর্ষায় জাল ফেলা হয়। ফলে বেশ কিছু বাঁশ এখানে গেড়ে দেওয়া যাচ্ছে। অন্য মৌসুমেও এই বাঁশ থেকে যায়। এই বাঁশগুলো নিচে থাকাবস্থায় খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে কেউ ওপর থেকে পড়ে গেলে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। পরিমলের সাইকেল চলে গেছে স্রোতের সাথে একদিকে, যেখানে সাইকেল আটকে আছে দুই বাঁশের মাঝখানে। আর সে নিজে ভাগ্যগুণে পড়েছে বাঁশের চিপায়। সেখানেই সে আটকে গিয়ে অজ্ঞান। বাঁশ বরাবর পড়লে তা বুক ভেদ করে যেত। বাঁশের সাথে তার গায়ের শার্ট ছিঁড়ে আটকে গেছে। অজ্ঞান অবস্থায় সে পড়ে আছে সেখানেই।

সকালের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শেষে স্বাভাবিক দিনের শুরু। ব্রিজের নিচের দোকানের কর্মচারী পিনু দোকান খুলেছে। একটা ডাল ভেঙে মেসওয়াক করতে করতে ব্রিজের ওপরে এসে দেখে একটা সাইকেল পড়ে আছে ব্রিজের নিচের দিকের বাঁশের কাছে। আরেকটু এগিয়ে দেখে ব্রিজের নিচের দিকে একটা শার্ট ঝুলছে। সে পকেট থেকে ফোন বের করে ভিডিও করে। সেই ভিডিও আপলোড করে দেয় নিজের ফেসবুকে। পিনু ফেসবুকে পোস্ট দিলে দশটা পোস্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাইক যেটার মধ্যে থাকে, সেটার মধ্যে একটা লাইক থাকে তার। আর একটা লাইক থাকে রসুর, যে রসু সারা দিন ওর দোকানে বসে ফোনে সবিতা ভাবির ভিডিও দেখে। কখনো দুই-এক পোস্টে একটা স্টিকার কমেন্ট করে। এ ছাড়া পিনুর পোস্টে মশা-মাছিও উঁকি দিতে আসে না। পিনু ফোন দোকানে রেখে নদীর ঘাটে এসে হাতমুখ ধুচ্ছে। আর বিরতিহীন ফোন বাজছে। এই ফোন নিশ্চয়ই দুলাভাই দিয়েছে। দোকানের মালিক হারিছকে পিনু দুলাভাই বলে ডাকে। এই ফোন সে সকাল দশটার আগে ধরে না। দিলে দিক। আস্তেধীরেই যাবে। হাতমুখ ধুয়ে সে দোকানে এসে ফোন

হাতে নেয়। ১৭টা মিসড কল। নানান নম্বর। আবার ফোন আসে। ফোন রিসিভ করে পিনু। ফোন দিয়েছে কে যেন। ফোনের ও প্রান্তে কেউ হাঁপাচ্ছে, ওই পিনু, তোর ভিডিও ভাইরাল। দেহস নাই ? পিনুকে মাঝেমধ্যেই দোকানে এসে উত্তরপাড়ার ছেলেপেলে এসব বলে খেপিয়ে দেয়। তাই সে গায়ে মাখে না। আবার ফোন আসে। একই কথা। পিনু রাগ করে ফোন অফ করে রাখে। দোকানের মেঝে ঝাড়ু দিতে থাকে। গোছগাছ করে। হঠাৎ কান পেতে লোকজনের হট্টগোল শুনতে পায়। ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করে। ব্রিজভর্তি মানুষ। কী রে ? কী ঘটনা ? এত সকালে এত মানুষ কেন ? পিনু ফোন অন করে। নেট অন করে। নিজের প্রোফাইলে যায়। পঁচিশ মিনিটে সাড়ে চার হাজার শেয়ার, ভিডিওর ভিউ হয়েছে ছয় লাখ সাতাশ হাজার। পিনু খুশিতে দোকান বন্ধ করে। আজ সে উত্তরপাড়া নিজে যাবে। শালারা ইয়ার্কি করে, এবার দেখাবে ফেসবুকে লাইক কাকে বলে! পিনু দৌড়ে ব্রিজের কাছে আসতেই 'ওই যে শালা, ধর শালারে' বলে অনেকে তেড়ে আসে। পিনু পেছনে তাকায়। কাকে খোঁজে এরা ? সামনে তাকাতেই কয়েকজন ঘিরে ধরে পিনুকে, পরিমলের লাশ কই ডুবাইছস, ক বাইঞ্চোদ। পিনু বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। পিনুকে বেঁধে ফেলা হয়। একজন পরিপাটি পোশাকের লোক এসে উত্তেজিত সবাইকে থামায়, থানায় ফোন করেছি। ওসি সাহেব আসুক। কেউ ওর গায়ে হাত দিয়ো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তেড়ে আসে লোকজন। যেন এখনই ছিঁড়ে ফেলবে পিনুকে। ভিড় বাড়তে থাকে। ভিড়ের সাথে যুক্ত হয় পরিমলের স্বজনের চিৎকার, 'হরে রাম হরে রাম।' পরিমলের লাশটা আগে দিক। তাদের চাওয়া এটাই। উত্তেজিত লোকজন পিনুকে যেন খেয়ে ফেলবে। কেননা, পরিমল এ অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক। অঙ্কের স্যার। ভীষণ জনপ্রিয়। এদিকের প্রায় সকলেই তার শিক্ষার্থী। পরিমলের লাশ গুম করে ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য নিজেই নাকি ভিডিও আপলোড করে এই কাহিনি শুরু করেছে পিনু। আরও কত রকমের কথা চারপাশ থেকে ভেসে আসছে। পিনুর কানে ঝিম ধরে যায়। মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে।

বড় শোল মাছ অর্ধেক খেয়ে আর গিলতে না পেরে যে রকম করে আধমরা হয়ে শুয়ে থাকে বয়সী ঢোঁড়া সাপ, সে রকম চিত হয়ে শুয়ে আছে চাতুটিয়া বাজারের পাশের ঝিনাই নদী। নদীর মোচড় আছে, তবে সেই মোচড়ে জলের ঘূর্ণি নেই। জলের ঘূর্ণির একটা আলাদা শব্দ থাকে, জাদু থাকে

সেই ঘূর্ণিতে। তীরে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা বাঁশের কঞ্চি ছুড়ে মারে সেই ঘূর্ণিতে, মোরগ ফুল ছুড়ে মারে, সেই কঞ্চি বা মোরগ ফুল ঘূর্ণির পাশে গিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণির গভীরে হারিয়ে যায়। সেই হারিয়ে যাবার দৃশ্য উপভোগ করতে প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ছেলেমেয়েরা একরকমের উৎসবে যুক্ত হয়। বড়দের কেউ এসে তাদের ধাওয়া করে। কেননা, এই ঘূর্ণিতে নাকি জিন থাকে। তবে চাতুটিয়া বাজারঘেঁষা নদীটার মোচড়ে ঘূর্ণি নেই। অথচ এখানে ঘূর্ণি থাকার কথা ছিল। নদীর গতিপথে অধিকাংশ মোচড়ে ঘূর্ণি থাকে। ঘূর্ণি না থাকলেও চাতুটিয়ার এই বাজারে সন্ধ্যা নামলে তো ভয় এসে গ্রাস করেই, ভরদুপুরেও একরকম গা-ছমছম ঘটনা থাকেই। এর কারণ, এই বাজারে কয়েক শ বছরের পুরোনো কয়েকটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। নদীর কোল ঘেঁষে যেখানেই এ রকম বুড়ো বটের গাছ আছে, সেদিকে জিন আর দেও-দানবের বসতি থাকে, এটা গ্রামের মানুষের চিরায়ত বিশ্বাস। এর মধ্যে বটগাছের নিচের নদীটার সম্মুখেই সেই মোচড়। আর মোচড়ে পুরোনো একটা শ্মশানঘাট। সেই ঘাটে বর্ষাকালে কিছু পড়ে না থাকলেও কার্তিক মাসের পর থেকে একটা-দুইটা হাড় কিংবা মাথার খুলি স্পষ্ট দেখা যায়। তাই চাতুটিয়া বাজারের এই জায়গাটা স্বাভাবিক জায়গা মনে হয় না অনেকের কাছেই। এই বাজারের অন্য পাশের গ্রাম পানকাতায় পরিমলের বড় বোন আলপনার শ্বশুরবাড়ি। সে দিদির বাসায় পরিমল এসেছিল সকালেই। দিদি তাকে না খেয়ে আসতে দিল না। খেয়ে শরীর ক্লান্ত লাগল। ঘুমিয়ে গেল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায় বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়া যাবে না। দিদির নিষেধ। তাহলে রাতের খাবার খেয়েই যেন যায়। দিদির হাতের রান্না অতুলনীয়। ভোজনরসিক পরিমল তাই রাতের খাবার খেয়েই বের হয়েছিল দিদির বাড়ি থেকে।

পানকাতা থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় সে আসতে পারত ঝাওয়াইলের রাস্তায়। সেদিকে না গিয়ে সে গেল পাগলাবাজারের রাস্তায়। ওদিকে তার কলেজের বন্ধু ইমরানের বাড়ি। ইমরানকে ফোন করেছিল। সে বলেছে, যাবার পথে যেন দেখা করে যায়। হাইস্কুলের শিক্ষক পরিমল যেখানে-সেখানে সিগারেট খেতে পারে না। ইমরানের সাথে চা-সিগারেট খেয়ে তারপর বাড়ি যাওয়া যাবে। এদিকে আজ যে অমাবস্যার রাত, সে কথা মনে নেই পরিমলের। পাগলাবাজার থেকে যে রাস্তাটা ঢালুর দিকে চলে গেছে, সেদিকে সাইকেলের ব্রেক হালকা কষে ধরে পরিমল ধীরে ধীরে সাইকেল চালাতে থাকে। একটা দোকানের সামনে দাঁড়ায়। সেখানে লোকজন টেলিভিশনে

ভোজপুরি নাচ দেখছে। আগে এই সংস্কৃতি ছিল না। কয়েক বছর আগেও এই সব টেলিভিশনে বাংলা সিনেমা চলত। এখন চলে ভোজপুরি গান। বড়ই অশ্লীল গান। এখানে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সে ফোন করে ইমরানকে। ইমরানের নম্বর বন্ধ। অগত্যা সে নদীর তীর ঘেঁষে সরু পথেই সাবধানে সাইকেল চালায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাইকেলের সামনে লাগানো চার্জার লাইটের চার্জ কমে যাচ্ছে। চাতুটিয়া বাজার পার হয়ে মূল রাস্তায় উঠে সে চলে যাবে পাথালিয়ার ভেতর দিয়ে নতুন রাস্তায়। সোজা রাস্তা। একটানে চলে যাবে। এই ভেবে সে চাতুটিয়া বাজার পর্যন্ত আসতেই তার সাইকেলের লাইটের চার্জ শেষ হতে দেখল। অন্ধকারে সাইকেল চালানো কঠিন। সে নেমে সাইকেল ধরে নদীর পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে ফোনের লাইট অন করল। বাজারের সব দোকান খোলা থাকে বাজার চলাকালে। রাতে এশার নামাজের পর এখানে কাকপক্ষীও পাওয়া যায় না। ফোনের লাইট সামনে ধরতেই একটা প্যাঁচার ডাক শুনতে পেয়ে কেঁপে উঠল পরিমল। প্যাঁচা বা প্যাঁচক একপ্রকার নিশাচর শিকারি পাখি। বেশির ভাগ প্যাঁচা ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন ইঁদুর, কীটপতঙ্গ শিকার করে, তবে কিছু প্রজাতির মাছও ধরে। প্যাঁচা ওপর থেকে ছোঁ মেরে শিকার ধরতে অভ্যস্ত। শিকার করা ও শিকার ধরে রাখতে এরা বাঁকানো ঠোঁট বা চঞ্চু এবং নখর ব্যবহার করে। বইয়ে পড়া প্যাঁচাসংক্রান্ত এই সব তথ্য সে আওড়াতে আওড়াতে সাহস সঞ্চয় করতে থাকে। পরিমল কি ভয় পাচ্ছে ? একদম না।

বটগাছের নিচে এসেই পরিমল থমকে দাঁড়ায়। হাত থেকে ফোন পড়ে যায় মাটিতে। কাউকে যেতে দেখল। কে ওটা ? মাটি থেকে ফোন তুলে লাইট ধরল সেদিকেই। এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। সে গালি দিয়ে বসল, ওই, কোন অসভ্য রে, বাইরে যাইতাছে মাইয়া মানুষ, এইডা বোঝে না। অসভ্য। বলেই মহিলা দৌড়ে রাস্তা থেকে সরে নদীর দিকে না গিয়ে বাম পাশে বাড়িঘরের দিকে চলে গেল। পরিমল এতক্ষণে টের পেল, ভয় পেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানুষ বলদ হয়ে যায়। সে শিক্ষিত মানুষ। সে কেন ভয় পাচ্ছে! এই পথঘাট তো তার অচেনা নয়। গা ঝাড়া দিয়ে পরিমল এবার সাইকেলেই উঠে বসল। কারণ, নদীর সেই মোচড়ের জায়গাটা সে পেরিয়ে এসেছে। এখন সে মূল রাস্তায়।

ভাদ্র মাসের অন্ধকার রাত কিছুটা আলাদা বিপদের গন্ধ নিয়ে আসে। একে তো ভ্যাপসা গরমে এক বিপদ, আবার বৃষ্টি হলে আরেক বিপদ। গরম

উত্তাপ ছড়াতেই এদিকের সব বিষধর সাপ বেরিয়ে আসে। যেনতেন সাপ নয়, একেকটা পাঁচ হাত থেকে সাত হাত পর্যন্ত। রাস্তার পাশের শণের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ঘুরে বেড়ায়। এমনিতে কাউকে ছোবল দেয় না, তবে সামনে গিয়ে সাপকে বিরক্ত করলে তার বিষে নীল হয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া আর অন্য পথ খোলা থাকে না। আর বৃষ্টির সময় পাকা সড়কে কোনোমতে চলা গেলেও কাঁচা রাস্তায় চলাটা দুরূহ ব্যাপার। পরিমল তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর জন্য ঝাওয়াইলের পাকা রাস্তা ছেড়ে পাথালিয়া থেকে যে সরু কাঁচা রাস্তাটা ডগাবিলের বুক চিরে বিলডগায় পৌঁছেছে, সেই রাস্তায় চলে আসে। বিলডগার পরই তার নিজের গ্রাম বনমালী।

এ অঞ্চলের সব বিলের আদল একটা সীমারেখার পর বাকিটা আকাশের মতো খোলা। যেদিকে জল শুরু হয় তো শুধু জলের দেখাই মেলে। সেই জলের ঢেউয়ে বাতাসের সখ্য আর স্নিগ্ধ বাতাস যেন অসুখী মানুষকেও ডেকে এনে সুখী করে দেয়। তবে ডগাবিলের আদল স্টিলের নতুন থালার মতো। চারদিকে গ্রাম। সব সীমারেখা অনেকটা স্পষ্ট। সব গ্রাম যেন বিলটাকে ঘিরে রেখেছে বৃত্তাকারে। তাই বলে আকারে যে ছোট, সে-ও নয়। অন্যান্য বিলের সাথে এর তফাত জলের চলনে। অন্য বিলের জল বাতাস পেলেই দুলতে দুলতে এগিয়ে যায়। ডগাবিলে জলের কাঁপন আছে, চলন নেই। এই বিলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আগে নৌকায় যেতে হতো। কয়েক বছর আগে বিলের মাঝখানে সড়ক হয়েছে। জলের ধারা প্রবহমান রাখতে সড়কের মাঝখানে একটা ব্রিজ হয়েছে। সেই ব্রিজ করতে গিয়ে ব্রিজের গোড়ার দিকে অনেক গভীর করে মাটি কাটতে হয়েছে। মাটি কাটার কারণে এখানে চৈত্র মাসেও জল থেকে যায়। সারা বছর জলের এই জেগে থাকার কারণে জায়গাটাকে গ্রামের মানুষ নাম দিয়েছে 'দও'। এই দওয়ের কাছে দুই বছর ধরে যাওয়া যাচ্ছে না। কে নাকি মাছ ধরতে এখানে নেমেছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। ফলে সন্ধ্যার পর একা কেউ এদিকে আসে না। আর বর্ষায় তো আরও ভয়। ব্রিজের নিচে স্রোতের গতি কম নয় একেবারে। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, এই দেও-দানবের বসতি যে দও, তার পাশেই সড়ক ঘেঁষে একটা দোকান করেছে মজিদপুরের হারিছ। আর সেই দোকানে রাতেও ঘুমায় পিনু। পিনু বেশ সাহসী এবং শয়তান কিসিমের মানব। সে জলের বুদ্‌বুদ শুনলে তার ফোনে ভিডিও করে। সেই ভিডিও শেয়ার ইট দিয়ে পাচার করে দেয় নানানজনের ফোনে। মানুষের ভয়

আরও ঘন হয়। ভয় দেখানোর এই কৌশলে সফল হয়ে বিরাট এক পৈশাচিক আনন্দে নিজের জীবন উপভোগ করে পিনু।

বাড়িতে পরিমলের বউ চন্দনা সেই কখন থেকে জেগে আছে। পরিমলের আসার নাম নেই। বাবা-মা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। পরিমল আসতেই যেন ডেকে দেয়, এটা বলেছেন ঘুমানোর আগে। সারা দিন রান্নার ভিডিও দেখতে দেখতে ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে। কারেন্ট নেই সকাল থেকে। ফোন চার্জ দেওয়ার উপায় নেই। পরিমলকে ফোন করে যে জানবে কত দূর এসেছে, সেই বুদ্ধি পাচ্ছে না চন্দনা। বাবার ফোনে চার্জ থাকতে পারে, তাকে এত রাতে ডাক দেওয়া কি ঠিক হবে ? যাক, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। এ বাড়ির সামনেই একটা ছোট রাস্তা। পাকা হলেও এর পিচ নষ্ট হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ। রাস্তার ওপাশেই একটা খাল। বহু পুরোনো খাল। সেই খালের পাড়েই একটা পুরোনো বাঁশঝাড়ের নিচে পরিমলদের বাড়ি। দুই বাড়ি পরই মূল রাস্তার সাথে বনমালী প্রাইমারি স্কুল। তবে রাতের বেলা জায়গাটা একদম নির্জন হয়ে যায়। দুই-চারটা দোকান আছে স্কুলের পাশে। কিন্তু বৃষ্টি হলে আগেভাগে লোকজন চলে যায়। আর এখন তো রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। একে তো কারেন্ট নেই, তার মধ্যে রাত হয়েছে বেশ। স্কুলের পাশের দোকানও মনে হয় বন্ধ করে লোকজন চলে গেছে। কারও ফোন থেকে যে পরিমলের খোঁজ নেবে, সেই বুদ্ধি কাজ করছে না চন্দনার মাথায়। রাত যত গভীর হচ্ছে, তার চিন্তা তত বাড়ছেই।

বাংলাদেশের বউদের একটা স্বভাব আছে, সেই স্বভাবটা অবশ্য তারা পেয়ে থাকে মায়েদের কাছ থেকে। বাড়ির কেউ যখন আসতে দেরি করে, ঘর থেকে বেরিয়ে অকারণ রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কান পেতে থাকে গাড়ির শব্দের, সাইকেলের ক্রিং ক্রিংয়ের। চন্দনাও বের হলো। সে বড় রাস্তায় যাবে। কারেন্ট থাকলে বাইরে যাওয়া ব্যাপার ছিল না, এখন খুঁজে খুঁজে হারিকেন বের করে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে সে বের হয়। বাঁশঝাড় পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে যেতেই হারিকেনের আলোয় সে দেখতে পায় একটা বাঁশের সাথে আরেকটা বাঁশের ধাক্কা খেতেই ক্যামন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে, থামছে না। রাতে কখনো একা ঘর থেকে বের হয় নি আগে। আজই প্রথম। সেটাও এমন অন্ধকারে। চন্দনা থ মেরে দাঁড়িয়ে যায়। ভালো করে কান পাতে। কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে কি ? বাতাস নেই। থমথমে আকাশ। বাতাস ছাড়া কীভাবে এই বাঁশ এত নড়ছে, ভেবে পায় না চন্দনা। মানুষের চিরকাল এক বৈশিষ্ট্য, যেদিকে

গেলে ভয় বেড়ে যায়, সেদিকে আরও দুই পা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিত হয়। তারপর নিশ্চিত হতেই পেছনে ঘুরে দৌড় দেয়। চন্দনা এগিয়ে যায়। বাঁশের ক্যাঁচক্যাঁচ ক্রমশ ঘন হচ্ছে। ভীরু পায়ে চন্দনা সামনে যেতেই দেখে দুই বাঁশের মাঝখানে সাদা কাপড় পরা কে যেন আটকে আছে। সে ছুটতে পারছে না। চন্দনার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। হাত থেকে হারিকেন পড়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে যায় চন্দনা।

চেনা রাস্তা অন্ধকার থাকলেও মানুষের চলতে অসুবিধা হয় না। তবে সাইকেলে ব্যাপারটা সহজ নয়। সাইকেলে গেলে সময় লাগত পনেরো মিনিট। হেঁটে গেলে লাগবে এক ঘণ্টা। হাঁটতে হাঁটতে এক ঘণ্টা পার হয়ে যাবে। আর মানুষের সঙ্গে যখন মানুষ থাকে না, তখন সঙ্গের যা থাকে, সেটাই সঙ্গী হয়ে যায়। যেমন কারও সঙ্গী হয় লাঠি, কারও সঙ্গী হয় হারিকেন, কারও সঙ্গী হয় মোবাইল ফোন। পরিমলের সঙ্গী হয়েছে সাইকেল। সাইকেলের দিকে মনোযোগ দিতে দিতেই সে সামনের দিকে যেতে থাকে। চার্জ শেষ হয়ে ফোন বন্ধ হয়ে গেছে। চন্দনা নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফোন বন্ধ পেয়ে পাগল হয়ে গেছে। পরিমল সাইকেলে না উঠে সাইকেল ঠেলে সামনে যেতে থাকে। যেতে যেতে চলে আসে ডগাবিলের ভেতরে চলাচলের জন্য এই রাস্তার ওপরের সেই আয়তনে ছোট আর উচ্চতায় অনেক উঁচু এক ব্রিজের কাছে। ব্রিজের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় কী হচ্ছে, কিছু দেখা যায় না। দিনের ঝকঝকে আলোতেও এখানে এসে কেউ সাইকেল চালিয়ে ওঠে না। অনেক উঁচু থাকায় সকলেই সাইকেল ঠেলে ব্রিজে উঠে তারপর সাইকেলে চেপে ঢালুর দিকে নেমে যায়। ওদিকের অংশেই হারিছের দোকান, যেখানে পিনু থাকে। সাইকেল ঠেলে সবে সে উঠেছে ব্রিজের ওপর, আর তখনই এক ভয়াল দৃশ্যের মুখোমুখি পরিমল। আকারে প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেকলেও একটা শিশু। তার দুই হাতে দুটো মাথার খুলি। সেই খুলি থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে এই দীর্ঘ দেহের শিশুর হাতের রক্তাক্ত খুলি কীভাবে দেখা যাচ্ছে ? পরিমল বাঁচতে চায়। সে শক্তি সঞ্চয় করে বলে, এই, সামনে থেকে সরে দাঁড়া বলছি। পরিমলের কথা শুনে সরে দাঁড়ায় না সে। সামান্য ওপরে উঠে যায়। শূন্যে ঝুলে থাকে। পরিমল তার সাইকেল তুলে তাতে উঠে বসে টান দিতে যায়। একটানে জলের গভীরে পড়ে যায়।